অমরকন্টক ভোরমদেও

– বিপুল সাহা

১।

ছ' বছর আগে বান্ধবগড়-কানহা-জব্বলপুর বেড়াতে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ছিল অমরকন্টক যাওয়ার। জব্বলপুরে থাকত সাধনা-সোমনাথ। সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখেছিল ওরা। এক আত্মীয়ার অসুস্থতার খবর পেয়ে সেসব বাতিল করে ছুটতে হয়েছিল দিল্লি।

চন্দন পণ্ডিত কন্যার পার্ট-ওয়ান এক্‌জামের সময় এনথু দেওয়ার জন্য বেড়ানোর ব্যবস্থা করল সেই অমরকন্টকে। এ সুযোগ ছাড়া যাবে না। আর কোন কারণে ঋণ থেকে শতহস্ত দূরে থাকলে কি হবে, বেড়ানোর ব্যাপারে নির্দ্বিধায় ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। গত ডিসেম্বরে ঝাড়গ্রাম ঘুরে এসে আবার ফেব্রুয়ারিতে বেরোনো? সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য বললে – আপনাদের পায়ের তলায় সর্ষে নয়, একেবারে রোলার লাগানো আছে দেখছি।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, ২০০৪। রোলার লাগানো পায়ে রাত নটা দশে ২১৩০ আজাদহিন্দ পুনে এক্সপ্রেস ধরে খড়্গপুর-টাটা-রৌরকেল্লা-ঝারসাগুদা-রায়গড় হয়ে বিলাসপুর। পথদূরত্ব ৭২০ কিমি। স্লিপার ক্লাসে ভাড়া ২৬৪ টাকা। উপরন্তু টিকিট পিছু চল্লিশ টাকা অন্যান্য গচ্চা। শেষ মুহূর্তে আরেকজন ভ্রমণার্থী যোগ দিয়েছে দলে। চন্দনের সোনাদি – মীরা ভৌমিক। উনি আছেন এসি কুপে।

বিলাসপুর পৌঁছনোর কথা সকাল ৭-৪০ নাগাদ। তারপর ট্রেন চলে যাবে রায়পুর-নাগপুর হয়ে পুনা। আমরা বিলাসপুর পৌঁছলুম সকাল আটটার পরে। ফেরার টিকিট ২২শে ফেব্রুয়ারি, রোববার, বিলাসপুর থেকে। চার রাত ও পাঁচ দিনের জন্য এই ট্যুর। সদস্য সংখ্যা ছয়।

বিলাসপুর থেকে পেন্ড্রা-অনুপপুর-শাহদোল-উমারিয়া-কাটনির ট্রেন আছে। আড়াই ঘন্টায় একশ' এক কিমি দূরের পেন্ড্রা রোড স্টেশন পৌঁছে সেখান থেকে

গাড়িতেও অমরকন্টক যাওয়া যায়। পেন্ড্রা থেকে অমরকন্টকের সড়ক দূরত্ব ৪৩ কিমি। দু ঘন্টার মতো লাগে। অমরকন্টক যাওয়া যায় অনুপপুর (৭৩ কিমি) বা শাহদোল (১০৬ কিমি) থেকেও। জব্বলপুর বা কানহা থেকেও চলা যায়।

আমরা বিলাসপুর থেকে সড়কপথে যাওয়ার জন্য গাড়ির খোঁজ করছিলুম। সওয়া শ' কিমি পথ। অটো ড্রাইভার কাল্লু ফোন করে ঘনশ্যামের গাড়ি আনিয়ে দিল। ভাড়া শ'দুয়েক বেশিই নিল – ১৩০০ টাকা। তবে একেবারে নতুন গাড়ি। নাম্বার প্লে-ট পর্যন্ত লাগানো হয়নি।

সকালের প্রাতরাশ সেরে যাত্রা করাই ভালো। ঘনশ্যাম নিয়ে গেল বাগিচা কোম্পানি গার্ডেনের কাছে এক চালু রেস্তোরায়। বারো টাকার দহিবড়া বেশ লেগেছিল।

আমাদের গতিমুখ পশ্চিমদিকে মুঙ্গলি রোড ধরে। কিছুটা এগিয়ে ডানহাতে বাঁক নিয়ে গাড়ি ছুটল উত্তরমুখী কোটার দিকে। ৩২ কিমি দূরে কোটা। বিলাসপুর থেকে ট্রেন যাচ্ছে কোটা হয়ে পেণ্ড্রা রোড। লোর্মির দিকে এগিয়ে ডাইনে বেঁকে চেকপোস্ট পেরিয়ে শু(হল অরণ্যাঞ্চল – আচানকমার অভয়ারণ্য। অবস্থান সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর মৈকাল পাহাড়ের কোলে। বিলাসপুর থেকে প্রায় ৫৪ কিমি দূরে। ৫৫২ বর্গকিমি এলাকায় শাল ও বাঁশ প্রচুর। বাঘ, চিতাবাঘ, গউর, ভল্লুক, বরাহ, হরিণ আছে। বৈগা, গোন্দ, ওরাঁও উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণি থেকে উদ্ভূত আদিবাসী এরা। অরণ্যভূমি সরস রেখেছে নর্মদা, শোন আর জোহিল্লা নদী।

বস্তার অঞ্চলে মূলত গোন্দ উপজাতির বাস। ভূতত্ত্বে প্রাচীন এক মহাদেশের কথা পড়েছিলাম। নাম গণ্ডোয়ানা – আফ্রিকা-দখিণ আমেরিকা-অ্যান্টার্কটিকা-অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল সেই অতিকায় মহাদেশ। মধ্যপ্রদেশের গণ্ডিয়া নামক স্থানে কার্বোনিফেরাস যুগের নিদর্শন প্রথম পাওয়া গিয়েছিল বলে ঐ যুগের মহাদেশের নামকরণ হয়েছে গণ্ডোয়ানা।

অরণ্য চিরে মসৃণ সড়ক সামনে। চলতে চলতে ড্রাইভার ঘনশ্যাম সোনি হঠাৎ ব্রেক কষল। দেখি পথের পাশে একটি স্মৃতিফলক রয়েছে। পঞ্চান্ন বছর আগে এই বিন্দাবল গ্রামে বাস করত মাইকা গোন্দ নামের আদিবাসী যুবক। বাঘের সঙ্গে একা লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিল সে - এখানে। স্মৃতিফলক তারই নামে।

চলার পথ রোমাঞ্চকর। চমৎকার মিঠে রোদ্দুর। দুধারে উঁচুনিচু পাহাড়-টিলা আর সবুজ বন। বনবাসী হনুমানের দল পিচঢালা সড়কের উপর বসে খোশমেজাজে জটলা করছে। গাড়ির শব্দে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ লেজ তুলে পলায়নে তৎপর। মাঝে

মাঝে আদিবাসী গ্রাম পড়ছে। কখনো শুকনো নালায় জলধারার চিহ্ন। সামনে লামনি স্যাংচুয়ারি। এগিয়ে যাচ্ছি। বিলাসপুর থেকে ৭৪ কিমি এবং আচানকমার থেকে ১০ কিমি দূরে ছাপরোয়া। প্রায় ১০০ কিমি দূরে ত্রিমুখী জংশন কেঁওচি। চা-পান করা হল কেঁওচি বসে। পেণ্ড্রা রোড স্টেশন থেকে রাস্তা এখানে এসে মিলেছে। অমরকন্টক আরো ২৫ কিমি দূরে। সেখানে পৌঁছতে মোট সময় লাগল সাড়ে তিন ঘন্টার মতো।

অমরকন্টক তখন লোকে লোকারণ্য। দোকানপাট বাস অটো আর লোকজনে জায়গাটা গিজগিজ করছে – রাস্তায় চলাচল করাই দায়। কেন? না সামনে শিবরাত্রির মেলা আছে যে।

টুরিস্ট হোমের সিধে রাস্তা অবধি বন্ধ। মন্দিরের পাশ দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে অবশেষে পৌঁছনো তো গেল সেখানে। পৌঁছে শুনি নতুন সমস্যা। কোন এক খ্যাতনামা গুরুদেবের আগমনের জন্য কালেক্টর সাহেব সমস্ত ঘর দখল করে নিয়েছেন। আমাদের মতো অভাগা যারা অগ্রিম ঘর বুক করেছে, তাদের রামকৃষ্ণ কুটিরে আপাতত স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। দিল্লি থেকে আসা আরেকটি বঙ্গীয় দলও একই পংক্তিতে। নিরুপায় বলে এই লাঞ্ছনা মেনে নিতে হল। আবার ঘুরে ঘুরে ভিড় ঠেলে ফিরে চলা পিছনে ফেলে আসা রামকৃষ্ণ কুটিরে।

অমরকন্টকে শিবচতুর্দশী ও নাগপঞ্চমীতে জোর মেলা বসে। সুতরাং ভিড় তো হবেই। আসলে আমরা ভালো করে হিসেবনিকেশ করিনি। ভুল করে বেছে নিয়েছিলাম ঠিক শিবরাত্রির দিনটি। একেবারে শেষমুহূর্তে স্থানাভাব হতে পারে ভেবে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট হোমের ঘর বুক করতে গিয়েছি। দুশয্যার ঘরের ভাড়া এমনিতে ৩২৫ ও ৪৯০ টাকা। তিনদিনের জন্য একখানা মাত্র ঘর পাওয়া গেল। প্রবীণ নাগরিকত্বের সুবাদে কিছু সুবিধাও। আর তৃতীয় দিনের জন্যই কেবল আরেকখানা ঘরের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই বুক করা হল। প্রথম দুটো দিনের জন্য অন্য কোথাও একখানা ঘরের বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। এখানে এসে দেখছি বুক-করা ঘরেরও অস্তিত্ব নেই। তবু ভালো কর্তারা অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে।

মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলা জেলায় অবস্থিত অমরকন্টক। বিন্ধ্যপর্বতের সর্বোচ্চ শিখর ৩৫০০ ফুট উঁচু মেখল পাহাড়ে রচিত হয়েছে এই তপোভূমি। মেখল বা মাইকাল বা মৈকাল পাহাড়। আমাদের অবশ্য মহাকাল নামটাই পছন্দ হচ্ছিল। সাতপুরা-মহাদেও-মহাকাল পাহাড়শ্রেণি ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিভেদ গড়ে তুলেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমে ছোটনাগপুর এলাকা এবং পূর্বে বিন্ধ্য পর্বত।

অমরকন্টক নর্মদা ও শোন নদীর উৎসস্থলও। 'নর্ম দদাতি ইতি নর্মদা'। পুরাণে নর্মদা রেবা নামেও পরিচিত। রেবতে ইতি রেবা। রেবার অর্থ উচ্ছলিত-উদ্বেলিত হয়ে গমন। আবার মেকল পর্বত থেকে জাত বলে অন্য নাম মেকল-সুতা। স্তরে স্তরে বিন্ধ্য পর্বতমালার অংশ হিসেবে মেকল পাহাড় ছড়িয়ে আছে চারদিকে। চারদিকে শাল ও অনান্য গাছপালায় ছাওয়া চমৎকার আরণ্যক পরিবেশ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে 'অমরাণাং কটঃ' থেকে অমরকন্টকের নামকরণ। যদি প্রশ্ন করেন, কট মানে কি হস্তীগণ্ড না তৃণাসন, তবে আমি নাচার। একবার সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধে হাজার দেবদেহের বিনাশ ঘটে। সেই রক্তপাতে নাকি অমরনালার সৃষ্টি হয়। শুনে অবাক হয়ে ভাবি – সত্যযুগেও যুদ্ধ? এবং তাও দেবাসুরের মধ্যে? কালিদাসের মেঘদূতম কাব্যে অমরকণ্টক আম্রকূট নামে উল্লিখিত।

রামকৃষ্ণ কুটিরের স্বামীজী বিশ্বাত্মানান্দ অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমরা তার সহানুভূতি অর্জন করতে পেরেছিলুম। তিনি দয়া পরবশ হয়ে ট্যুরিস্ট হোমের পরিবর্ত ঘরের সঙ্গে আরেকটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল মেয়েরা বড়ো ঘরে থাকবে আর ছেলেরা ছোট ঘরে।

গাড়িচালক ঘনশ্যাম প্রাপ্য ভাড়া বুঝে নিয়ে ফিরে গেল বিলাসপুর। মানুষটিকে সবার খুব পছন্দ হয়েছে। ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। তিনদিন পরে ফোন করলে চলে আসবে আমাদের বিলাসপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে ভালো করে খোঁজখবর করে রাখবে ছত্রিশগড়ের মিনি খাজুরাহোর হদিশ।

রামকৃষ্ণ কুটিরের চমৎকার পরিবেশে এসে অ-লাভ হল না আমাদের। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সামনের ভবনে দ্বিতলে মন্দির ও উপাসনা কামরা। লাইব্রেরি ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পিছনের সারিতেদুখানা করে ঘরের ইউনিট। এমনি গোটা চারেক ইউনিট আছে। সামনের অঙ্গনে ফুলের বাগান। শান্ত স্নিগ্ধ বাতাবরন। মন জুড়িয়ে যায় এক লহমায়।

মুস্কিল হল কাছাকাছি খাওয়ার কোন জায়গা নেই। মন্দিরেও আজ ভোগপ্রসাদ পাওয়া যাবে না। শিবরাত্রির উপবাস চলছে। স্নান সেরে হাঁটা দিলাম আহার্যের খোঁজে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে প্রথম যে হোটেল পেয়েছি, নিরুপায় না হলে তাতে খাওয়া চলে না। তো সেখানেও উপচে-পড়া ভিড়। শালপাতায় কুড়ি টাকায় নিরামিষ থালি। বলে রাখি, অমরকন্টকে সর্বত্র নিরামিষ ভোজন-ব্যবস্থা বহাল। ভোজনপর্ব সেরে নর্মদা মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।

দুপাশে সারি সারি মেলার অস্থায়ী দোকানপাট। স্থায়ী দোকানপাট-ধর্মশালা-ঘরবাড়ি আড়াল করে রেখেছে। নাগরদোলা, সার্কাসের তাবু, লোহা-লক্কর থেকে রসুইঘরের সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র, জামাকাপড়-জুতো-কোটপ্যান্ট, ওজন মাপার যন্ত্র, লাল-হলুদ সিঁদুর – কতো রকমের যে পসার নিয়ে বসেছে তারা, তার ইয়ত্তা নেই। জব্বলপুর থেকে এসেছে নরম মার্বল পাথরের শিল্পকর্ম।

হাজার হাজার ধর্মার্থী পুণ্যার্থী ও স্নানার্থী সমবেত হয়েছে। পনেরো আনাই গ্রাম্য সরল মানুষ। তাদের পোষাকে, চলনে-বলনে শ্রীছাদ নেই। এরা হোটেলে থাকবে না। ধর্মশালায় কেউ কেউ স্থান পাবে। অধিকাংশ থেকে যাবে খোলা আকাশের নিচে। রান্নাবান্না করে খাবেদাবে। ভোরভোর প্রাতঃকৃত্য সারবে সারা ময়দান জুড়ে। এদের ধর্মভাবনা প্রবল। প্রতিপদে আশঙ্কা এই বুঝি পাপ হয়ে গেল, অধর্ম হয়ে গেল। সুযোগ পেলেই তাই ছোটে পুণ্যের আশায়। স্নান পূজা আর দানধ্যান করে যদি পাপ স্খালন হয় সেই লোভে। সনাতন ভারতবর্ষ।

বাসস্ট্যাণ্ড বাঁ হাতে রেখে এগোচ্ছি। বাজার পেরোলেই প্রাচীর ঘেরা মন্দির এলাকা নজরে এল। সামনে প্রবেশদ্বার। বাইরে জুতো খুলে রেখে নগ্নপদে ভিতরে প্রবেশ করতে হল। খুঁটি পুতে লাইন দিয়ে যাত্রিসাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম করা হয়েছে। পুলিশ সুব্যস্থাপনায় নিযুক্ত।

ডানহাতে ঘুরে গিয়ে বিস্তৃত চত্বরের মাঝখানে পেলাম এগারো কোনার সরোবর। এর নাম মার্কণ্ডেয় কুণ্ড বা কোটিতীর্থ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে কুণ্ডে তথা কোটিতীর্থে। সরোবরের দখিণদিকে ছোট্ট একটু জায়গা ঘেরা রয়েছে আলাদা করে। সেখানে বুদবুদ করে জল উঠছে নিচ থেকে। এটাই হল নর্মদার উৎসস্থল – নর্মদা-উদগম বা নর্মদা-কুণ্ড। কুণ্ডের উপরে চৌকোনা কাঠামো রয়েছে। শিখরে গম্বুজ। পাশে মর্মর চত্বরে গৌরীপট্ট সহকারে শিবলিঙ্গ ও খুঁটিতে বাঁধা লাল-হলুদ-গৌরিক পতাকার গুচ্ছ।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে, একদা তপস্বী মহাদেব পার্বতী সমভিব্যাহারে ঋখ্খবান পর্বতে ঘোর তপস্যারত ছিলেন। সেই উগ্র তপস্যার ফলে তাঁর দেহ থেকে স্বেদকণা নির্গত হয়। সেই দিব্য স্বেদরাশিতে সমগ্র পার্বত্য এলাকা আর্দ্র হয়ে পড়ে। ত্র(মে তা থেকে এক স্রোতধারা উৎপন্ন হয়। দিব্য স্রোতধারা কন্যারূপ ধারণ করে শিব বন্দনায় দশ হাজার বৎসর ব্যয় করলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব নর্মদাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। নর্মদা বর চাইলেন যে জগতে নর্মদা যেন দখিণ গঙ্গা নামে পরিচিত হয়।

আর নর্মদাসলিলে স্নান করলে মানুষ সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে। শিব সেই প্রার্থনা মঞ্জুর তো করলেনই। উপরন্তু জানালেন যে তিনিও সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে নর্মদাতীরে অধিষ্ঠিত হবেন।

কেউ কেউ বলেন শিবের পদতল থেকে মানসকন্যা নর্মদার উৎসারণ। ঘর্মবিন্দু নর্মদা স্রোতধারা হয়ে পশ্চিম দিশায় প্রবাহিত। আবার শিবের শিরোভূষণ সোমকলা থেকে উৎপন্ন হওয়ার কথাও বলা হয়ে থাকে। আসলে তো ভূতল থেকে উঠে আসা এই জলধারা ত্র(মে আরো জলধারায় পুষ্ট হয়ে নদী হয়েছে। দীর্ঘ ১৩০১ কিমি পথ পরিক্রমা করে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছে ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হয়েছে। সর্বপাপনাশিনী মোখ্খদায়িনী জাতীয় গুণরাশি বা শতেকপুণ্য-পবিত্রতার দায় মানুষের। মেখলে পাহাড় থেকে জাত বলে নর্মদাকে মেখলা-কন্যাও বলে থাকে।

উদগম থেকে উত্থিত উদ্বৃত্ত জল লাগোয়া সরোবরে সঞ্চিত হচ্ছে। কুণ্ডে স্নানের ব্যবস্থাদি আছে। ভক্তগণ স্নান করে উদগমে পূজো দিচ্ছেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছেন। রাশিরাশি ফুলবেলপাতায় উদগমস্থল ভরে উঠছে। যদিও নোটিশ জারি করা হয়েছে যে কুণ্ডে ফুল, চাল, দুধ এবং অন্য সামগ্রী যেন না দেওয়া হয়। তবে কেউ সে নোটিশ মানছে না। এক ব্যক্তি বরঞ্চ জমা আবর্জনা পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

নর্মদা শুধু নদী নয়, নর্মদা দেবীও বটে। উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনার মতো। সাত পবিত্র নদীর মধ্যে একটি। কথিত আছে, সরস্বতীর জল তিন বার কিংবা তিন দিনে, যমুনার জল ছয় দিনে এবং গঙ্গার জল তখুনি পবিত্রতা দান করে। আর নর্মদার জল দর্শনমাত্রেই পুণ্য হয়। সরোবরে স্নানান্তে দেবীর পূজার্চনা বিধি।

উদগমের অনতিদূরে দখিণদিকে মর্মর নির্মিত চত্বর ধরে এগিয়ে অতি সাধারণ এক মন্দির। মাতা নর্মদার মন্দির। স্থাপত্য বর্ণনযোগ্য কিছু নয়। ভাস্কর্যের ছিটেফোটা নেই। এক কামরার মন্দির-গর্ভে রয়েছে কালো কষ্ঠিপাথরের তিন ফুট উঁচু নর্মদা মাতার মূর্তি। এক হাতে কমণ্ডলু অন্য হাতে বরাভয়। ভক্তগণ তাঁর প্রতি অনাবিল ভক্তিসহযোগে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

প্রাচীন নর্মদা মন্দিরটি নবম শতকে রেওয়ার রাজা মহারাজ গুলাব সিং তৈরি করেছিলেন। বলা বাহুল্য এরপর একাধিকবার তা ভগ্ন ও পুনর্নির্মিত হয়ে থাকবে। ১৯২৯ সালে ইন্দোরের রাজা শেষ মন্দির-সংস্কার করেন। বর্তমান মন্দিরটি গুলাব সিং-নির্মিত প্রাচীন মন্দির কিনা তা নিয়ে আমাদের সংশয় থেকে গেল। বর্তমান প্রবেশতোরণটি নির্মিত হয় ১৯৩৯ সালে। রেওয়া রাজাদের অর্থানুকুল্যে। নর্মদা

দেবীর মূর্তির সামনে মৈকাল-অধিপতি স্বয়ম্ভূ অমরকণ্টকেশ্বর মহাদেব ও পার্বতীর মূর্তি আছে।

নর্মদা-উদগম থেকে দেবীমন্দিরে যাওয়ার পথে পাথরের হাতি ঘিরে জনতার ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। হাতির পিঠে একজন মুণ্ডহীন সওয়ারী রয়েছে। হাতি ও সওয়ারী প্রস্তর-নির্মিত। ঐ হাতির সামনের ও পিছনের পায়ের ফাঁক দিয়ে সাষ্টাঙ্গে গলে যেতে পারলেই নাকি সমস্ত পাপকর্ম থেকে উত্তীর্ণ বলে স্বীকৃতি মিলছে। ধর্মার্থীরা মহা উৎসাহে একের পর এক তাদের পাপ-পুণ্যের পরীখ্খা দিয়ে চলেছে। এবং সকলেই পাপ-পুণ্যের কঠিন ধর্মীয় এগ্জামে সসম্মাণে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ তো বেশ মজার ব্যাপার হল! পাপ-পুণ্যের এমন সহজ যাচাই করার ব্যবস্থা থাকতে কেন যে তবে ব্যয়বহুল জটিল বিচারব্যবস্থা!

সমগ্র চত্বরে চব্বিশ মন্দির আছে। নাকি সাতাশটি? সবই সাদা রঙের ফ্যাটফেটে চেহারার। অধিকাংশ মন্দিরের চূড়ো লম্বাটে রেখদেউল আদলের। মাথায় কলস এবং ধ্বজা। কিছু মন্দির সরোবরের জলে নিমজ্জিত, কিছু মন্দির পাড়ে। যেমন সরোবর সলিলে নিমজ্জিত রয়েছে নর্মদেশ্বর অমরনাথ। বেণুবনে দেবতার বাস বলে তাঁকে বেণেশ্বর মহাদেব নামেও বন্দনা করা হয়। শঙ্কর ও নর্মদার যুগল মূর্তি আছে উভয় মন্দিরে। এ ছাড়া রয়েছে মনসা, কার্তিক, গোরখনাথ, রোহিনী, পার্বতী, বালাসুন্দরী ও শ্রীদুর্গার মন্দির। চতুর্ভুজ দেবতা আছে কোন এক মন্দিরে।

ভিড় সামলে ঘুরেফিরে দেখছি। তার মধ্যে চন্দনের পকেটমার হয়ে গেল। সাত-আটশ' টাকা ছিল মানিব্যাগে। সঙ্গে কিছু জরুরি কাগজপত্র। ভাগ্যিস মূল অর্থভাণ্ডার ছিল গৃহ-লক্ষ্মী শিখার কাছে। তীর্থখে'ত্র বলে তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-ঠকবাজি এসব সমাজ থেকে বিসর্জন দেওয়া চলে না। এখানে দেবদেবী থাকেন, ভকত থাকেন এবং চোর-ঠগীরাও থাকে। সকলেরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এলাম দেবস্থানের মহিমায় আপ্-ুত হতে-না-হতে।

আধুনিক মন্দিরচত্বরের বাইরে উত্তরদিকে রয়েছে প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন মন্দির রাজি। এখানে আছে প্রাচীন এক কুণ্ড – নাম সূর্যকুণ্ড।

সূর্যকুণ্ড নির্মাণ করেন রতনগড়ের রাজা কর্ণদেব। এই কুণ্ডে স্নান করলে নাকি চর্মরোগের বিশেষ উপশম হয়। অতীতে সূর্যকুণ্ডই প্রকৃত নর্মদা-উদগম স্থল ছিল। কিন্তু ছিল কেন? উদগম স্থল স্থান পরিবর্তন করল কি করে? সেটা অবশ্য আমরা জানি না।

থিকথিক করছে লোকজনের জটলা। খোলা মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছে যে যার মতো। এরা হাঁড়িকুড়ি-কড়াই জাতীয় জ(রী সামগ্রী নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছে। দিনান্তে কাঠকুটো কুঁড়িয়ে রান্নার আয়োজন করছে। কেউ কেউ রান্না চাপিয়েছে। এত পুণ্যার্থীর জটলায় পা ফেলার জায়গা নেই।

সূর্যকুণ্ডের পাড়ে প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীন বিষু(মন্দির। নির্মাণরীতি অনুসারে গর্ভগৃহ-অন্তরাল-মণ্ডপ দ্বারা সজ্জিত। মূল মন্দিরের বিমান রেখ-দেউল রীতি অনুসারে বঙ্কিম রেখায় আকাশগামী। মণ্ডপ পীড়াদেউলে সজ্জিত। গর্ভগৃহে লক্ষ্মী মূর্তি রয়েছে। একদা দা(ণ সুন্দর কালো পাথরের বিষু(মূর্তিও ছিল। মানুষ বিষু(দেবতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। পরে তাঁকে উদ্ধার করে যাদুঘরে রাখা হয়েছে। কথিত আছে – খীরসাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবতী কমলা এখানেই বসবাস করছিলেন। মহর্ষি ভৃগু ভগবান বিষু(র সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। দেবতাদের বিবাহে ঘটকালি করেছেন মহর্ষি – এটা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা ছিল খানিকটা। অবশ্য মূল্যহীন দ্বিধা।

পাশেই একই রকম আরেকটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। তার মণ্ডপ প্রায় ভেঙে পড়েছে। পাশে বাংলা চালাছাদের এক ভগ্নদশাগ্রস্ত মন্দির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটু পিছনের দিকে রয়েছে পাতালেশ্বর মহাদেব মন্দির। গর্ভে শিবলিঙ্গ নিমজ্জিত রয়েছে। নর্মদার নদীর উৎস সঠিকভাবে নির্ণয় করে শঙ্করাচার্য এই সূর্যকুণ্ডের পাশে মন্দিরটি স্থাপনা করেছিলেন। বছরে একবার, সম্ভবত শ্রাবণ মাসে, নর্মদার জল এসে এই শিবলিঙ্গকে প-াবিত করে। এ ঘটনা ধর্মার্থীদের কাছ অতি বিস্ময়কর মনে হয়। আমাদের কাছে তেমন আশ্চর্য ঘটনা মনে হল না। শুনেছি সেদিন নালার গেট খুলে কুণ্ডের জল ভিতরে ঢোকানো হয় মন্দির-গর্ভে। আচ্ছা, স্বয়ং শঙ্করাচার্য যে কুণ্ড নর্মদা-উদগম বলে ধার্য করেছিলেন তা পরে পরিত্যক্ত হল কি করে?

প্রাচীন মন্দিরগুলির পিছনে উঁচু একটি টিলা নজরে এল। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। টিলার উপরে রয়েছে সু-উচ্চ এক মন্দির – নাম কর্ণ মন্দির। ১১শ শতকে রতনপুরের রাজা কর্ণদেব কর্তৃক নির্মিত। টিলার উপর পাথর দিয়ে মানুষ সমান উঁচু বিশাল একটি সমতল চত্বর বানানো হয়েছে। তার উপর তিনটি প্রস্তর-নির্মিত মন্দির রয়েছে। কয়েক ধাপ ভেঙে চত্বরে উপরে উঠলাম। সামনে ও ডানহাতে দুটি মন্দির পড়ল। দেখছি দুটি মন্দির এখনও দণ্ডায়মান। বাঁহাতে তৃতীয় আরেকটি মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারলুম না। দরজা বন্ধ। গর্ভগৃহ বেষ্টন করে মন্দিরের রেখ-দেউল বিমান উর্ধ্বগামী। প্রবেশদ্বার সামনের দিকে

খানিকটা এগিয়ে এসেছে অন্তরালের মতো করে। তারপর শিখরবিমান জড়িয়ে অনেকটা উপরে উঠেছে।

কর্ণমন্দিরের পাশে রয়েছে শঙ্করাচার্যের আধুনিক মন্দির। দ্বিতল মন্দির। সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দ্বিতলে। সেখানেই রুদ্রদেবতা দেবতা বিরাজমান। চারদিক ঘিরে বারান্দা রয়েছে। সেখান থেকে গোটা অমরকণ্টকের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। আমরা সেখানে অনেকটা সময় বসলাম।

মধ্যভারতে তীর্থ হিসেবে নর্মদা বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। হয়তো গঙ্গার পরেই নর্মদার স্থান। ভারত নদীমাতৃক দেশ। সভ্যতা ও সম্পদ গড়ে উঠেছে নদীর প্রবাহ কেন্দ্র করে। নদীর নিকট ঋণবোধ থেকে নদীপূজা হবে হয়তো। আমরা সব নদীকেই কোন না কোন মর্যাদা নিয়ে পূজা করে থাকি। অধিকাংশ মাতৃরূপে। ব্রহ্মপুত্র (ব্রহ্মপুত্র) গোদাবরীর মতো দুচারটে নদী পিতৃরূপে।

নর্মদার জন্মদিন কবে? জানি না। নদীর আবার জন্মদিন হয় নাকি? চন্দনের ভাষায় – হয় হয় জানতি পারো না।

পরে জেনেছি – বশিষ্ঠসংহিতা মতে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে অশ্বিনী নখ'ত্র রোববার মকর রাশিতে নর্মদার পৃথিবীতে প্রকাশ। রাজা পু(কুৎস নর্মদাকে পিতৃলোক উদ্ধারের জন্য নিয়ে আসেন মর্ত্যলোকে। অনেকটা সগর রাজার গঙ্গাবতরণের মতো। এই পু(কুৎস রাজার কীর্তিকাহিনী আমার জানা নেই। তবে তা নাকি নর্মদার চতুর্থ অবতরণ। সোমবংশীয় পু(রূবা (পু(কুৎস?) কর্তৃক অবতীর্ণ হওয়ার কারণে নর্মদা সোমোদ্ভবা নামেও প্রসিদ্ধ।

নর্মদার প্রথম অবতরণ ঘটে সত্যযুগে রাজা হিরণ্যতেজা দ্বারা। দ্বিতীয় অবতরণ হয়েছে দক্ষ সাবর্ণ মন্বন্তরে এবং তৃতীয় অবতরণ বৈষ(ব মন্বন্তরে। তো একই নদীর একাধিক অবতরণ কেন? জানি না।

একদা নর্মদার তীরে বসেই দেবর্ষি নারদ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। প্রীত হয়ে শঙ্করমহাদেব নারদকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অবাধ ভ্রমণের বর দিয়েছিলেন। উনিও ঢেকিতে চড়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নারদ ছাড়া এখানে কপিল মুনি, মহর্ষি ভৃগু, মার্কণ্ডেয় মুনিরাও তপস্যা করেছেন।

রাতের ডিনারের জন্য রামকৃষ(কুটিরের সামনের চায়ের দোকান থেকে রুটি-সবজির ব্যবস্থা করল চন্দন। রাতের আকাশে অঢেল তারা। বাতাসে শীতল মেজাজ। অনেকটা হাঁটাহাঁটি হয়েছে। স্লিপার কোচে ঘুমোনোর সুযোগ থাকলেও সবটা ঘুমের

আমেজ মেলেনা। ছোট্ট ঘরখানায় ঢুকে আশ্রমের হালকা পু(লেপখানা টেনে নিলাম। তারপর কখন নিদ্রালোকে পৌঁছে গেলাম কে জানে!

২।

রামকৃষ(কুটিরের সামনের দিকে অবস্থিত এরণ্ডী সঙ্গম। পরদিন সকাল বেলায় ঘুরতে গিয়েছিলাম সেখানে। এখানকার গুফা-মন্দিরে স্বামী সীতারাম দাসজীর আশ্রম। নামেই গুফা, আসলে নয়। স্বামীজী গত হয়েছেন। ভকতরা আশ্রম চালাচ্ছেন। তিতলির এসব ভালো না লাগারই কথা। ও পিছনের টিলায় জঙ্গলে বিচরণ করতে গেল। শাল ইউক্যালিপ্টাস, আম, বয়ড়ার গাছগাছালিতে ভরা জঙ্গল।

সেদিন সকালের অনেকটা সময় বরবাদ হয়ে গেল ট্যুরিস্ট হোমের ঘর পাওয়া-না-পাওয়ার দোলাচলে। সকাল দশটা নাগাদ দিল্লির দলটিকে ট্যুরিস্ট হোমের কর্তারা নিয়ে যাচ্ছিল হোমে। সেকথা ওনারাই জানালেন। অথচ আমাদের জন্যে কোন আয়োজন নেই। কোন খবরও নেই। ফোন করলাম। ওরা জানাল – দুপুর বারোটা নাগাদ আমাদের জন্য ঘর খালি হবে।

একটু পরেই ফোন করে আবার জানাল যে ঘর খালি হবে বেলা একটার পরে। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল রামকৃষ(কুটিরে বসে থাকলে হোমের ঘর পাওয়া যাবে না। আমাদের দুরবস্থা দেখে স্বামীজী উদ্যোগী হয়ে দিল্লির দলটির সঙ্গে কথা বলে তাদের ভাড়া-করা গাড়িতে আমাদের হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। গাড়ির চালক ভালু নামের যুবক। স্বামীজীর চেনালোক।

হোমে পৌঁছে দেখি সেখানে তখন সদগু(দেব নারায়ণ দত্ত শ্রীমালীর প্রতিনিধি-পুত্রত্রয় ভকতদের প্রবল গু(বন্দনায় আপ্-ুত হয়ে সবে বিদায় নিচ্ছেন। এঁরা রাজস্থানের লোক। কারণ যোধপুর থেকে এদের 'মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র বিজ্ঞান' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক ভকত করজোড়ে এসে আমাদের জানাল – গু(জীর অপার মহিমার কোন আন্দাজা লাগাতে আমরা পারব না। আমাদের কষ্টের জন্য যেন তাদের কোন তকলিফ না দেওয়া হয়।

মনে মনে বলছি তখন – কে যে কাকে তকলিফ দিচ্ছে!

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ২০৬ নম্বর ঘরখানা পেতে পেতে বেলা আড়াইটে গড়াল। ম্যানেজার প্রসন্ন প্রতাপ সিং পরিহার পূর্ব-কৃত অসুবিধার ভার লাঘবের জন্য চন্দনকে একখানা ডিলাক্স কামরার ব্যবস্থা করে দিলেন। ২০৪ নম্বর ঘর।

দুপুরবেলা ড্রাইভার ভালুকে চন্দন জিজ্ঞেস করেছিল – তোমার গাড়ি যদি ফ্রি থাকে তবে আজ ঘুরতে বেরোনো যেত। আজ কি সাইট-সিয়িং করা যাবে?

ওর চটজলদি জবাব – হো যায়গা স্যর, চার বাজে আ যায়েঙ্গে।

চারটের বদলে ভালু হাজির হল বিকাল পাঁচটায়। এতটা বেলায় আর বেরোনো চলে না। ওকে ফিরিয়ে দিলাম। ঘরে বসে না থেকে আরেকবার নর্মদামন্দির ও প্রাচীন মন্দির-চত্বরে ঘুরে বেড়ালাম।

হোমের ব্যবস্থাদি চমৎকার। রাতের ঘুমটা জব্বর হল। সংলগ্ন রেস্তোরায় ভোজনও। পরদিন সকালে অমরকন্টকের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে বেরোনো হল। সদগু(র প্রাদুর্ভাবে এবং কালেকটর সাহেবের গু(-বন্দনায় আমরা গতকাল গোটা দিন হারিয়েছি। তৃতীয় দিনে যতটা দেখা সম্ভব হয় দেখব।

ড্রাইভার গাড়িভাড়া দাবি করেছিল এক হাজার টাকা। হোমের কর্মী জনৈক পণ্ডিত ড্রাইভারকে ধমকে রফা করল পাঁচশ' টাকায়। বুঝুন কাণ্ড – মেলার মরশুম বলে যে যেমন পারে কামিয়ে নেবে? সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই মনুষ্যধর্ম। নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন তোলে বোকা যারা।

সকাল আটটায় গাড়ি এসে হাজির। দ্রষ্টব্য স্থানাদি দুভাগে দেখা যায়। আমরা প্রথমে গেলাম অরণ্যপথে মাঈ-কা-বাগিয়া। এটি যেন তপোবনসুলভ একটি বাগিচা। কিন্তু প্রচুর ভক্ত সমবেত হয়েছে বলে তপোবনের শান্তি ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। বাগিচায় দেবী দুর্গা ও নর্মদার মন্দির আছে। রয়েছে মেকলেশ্বর মহাদেব মন্দির ও অন্নখেত্র। সামনে হনুমান মন্দির এবং পিছনে কৈলাস আশ্রমে শিবমন্দির। মন্দিরের হনুমান উৎপাত না করলেও চত্বরে ছড়িয়ে-থাকা হনুমানের দল নাকি সুযোগ পেলেই খুব উপদ্রব করে। সাধু-অসাধু উভয়কে সাবধান থাকতে হয়। আমরা অবশ্য হনুমানের উপদ্রব পেলাম না। এক ভক্ত জানাল – মানুষের ভিড় দেখে তারা দূরে সরে গিয়েছে।

লোকবিশ্বাস – আদিতে নর্মদার উদগম ছিল কোন এক বাঁশবনে। বর্তমানে উদগম রয়েছে বাগিচার আম্রকাননে অবস্থিত ছোট কুণ্ডে। উদগত হয়ে নর্মদার জলধারা আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুদূর পরে অমরকণ্টকে আবার তা প্রকট হয়।

নর্মদা-পরিত্র(মা এক পবিত্র পুণ্যকর্ম। নদী পরিক্রমাকে এখানে পরিন্দীখণা বলে। একমাত্র এই নদীটির বেলায় উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত দুই তীর বরাবর পরিক্রমার ব্যবস্থা আছে। এই মাঈ-কি-বাগিয়া থেকে যাত্রা শুরু করাই বিধি। দুরকমের পরিক্রমা

হয়। খণ্ড পরিক্রমায় কোন স্থান থেকে শু(করে সমুদ্র অবধি যেতে হয়। তারপর সমুদ্র পেরিয়ে অন্য তট ধরে অমরকন্টক এসে পুনরায় তট বদল করে শুরু-করা জায়গায় পৌঁছতে হয়। অন্য প্রকার হল জিলহেরী পবিক্রমা। মাঈ-কি-বাগিচা থেকে উত্তর তট ধরে যাত্রা করতে হবে সমুদ্র অবধি। তারপর ঐ তট ধরে আবার অমরকণ্টক ফিরতে হবে। তারপর দখিণ তট ধরে সমুদ্র অবধি যাত্রা করতে হবে। পরিক্রমা সাঙ্গ হবে সমুদ্রতট থেকে অমরকণ্টক ফিরে এসে। এই পবিক্র(মায় শুনলাম সাড়ে সাত বছর সময় লাগে।

মাঈ-কি-বাগিচায় অনেক নরনারী স্নানপর্ব ও পূজাপাঠ সারতে ব্যস্ত। কোথাও রান্নার আয়োজন চলছে। গাছগাছালিতে ছাওয়া জায়গাটি মনোরম। শান্ত পরিবেশ। তাই বলছিলাম তপোবন সুলভ।

এখানে এক সাধুব্যক্তি গুল্বকাবলি থেকে আরক বানিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করেছেন। চোখের রোগে নাকি বিশেষ উপকারী। ঘনশ্যাম সোনিও বলেছিল সেকথা। গাছগাছড়া থেকে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি এদেশের গ্রামগঞ্জের মানুষের প্রধান ভরসা। আমরা শহুরেরা যেন পুরোপুরি ভরসা করতে পারি না। এই এলাকায় ব্রাহ্মী, জটাশঙ্করী, কালিহলদি, পথরাচটা ইত্যাদি আরো নানা ঔষধি গুণসম্পন্ন জড়িবুটি পাওয়া যায়।

রঙমহল মন্দিরের পিছন দিকে বাঁহাতে দেড় কিমি এগিয়ে পড়ছে শোনামুড়া। শোন নদীর উৎস। আমরা মাঈ-কি-বাগিয়া দেখে সেদিকে চললাম। পাহাড়ের ঢালে কাঁকর বিছানো পথ। গাছগাছালিতে ছাওয়া শান্ত নীরবতা। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম শোনামুড়া। ডানহাতে পাহাড় আরো উপরে উঠেছে। বাঁহাতে বাধানো সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। শ' খানেক সিঁড়ি হবে। নিচে শোন নদীর উদগমস্থল।

শিবের দিব্যদেহ থেকে নির্গত স্বেদকণা থেকে জাত নর্মদা। এদিকে ব্রহ্মার অশ্রু থেকে জাত নদীর নাম শোন। ব্রহ্মার চোখে অশ্রু কেন উদগত হল তা জানি না। কোন কাহিনী আছে নিশ্চয়ই।

অন্য এক কাহিনী শোনা গেল। শিবকন্যা নর্মদার সঙ্গে শোনভদ্র নামক রাজপুত্র-সন্ন্যাসীর বিবাহ স্থির হয়েছিল। মতান্তরে শোনভদ্রর বিবাহ নির্ধারিত হয়েছিল মেকলে (বা মৈকাল) রাজার কন্যা নর্মদার সঙ্গে। এদিকে নর্মদার সহচরী শোনভদ্রের রূপে ও পৌ(ষে বড়োই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। নর্মদার রূপধারণ করে সে হাজির হল বিবাহবাসরে। সহচরীর ছলনায় প্রবল অভিমানে (ব্ধ হয়ে উঠল নর্মদা। ছুটতে শুরু করল প্রবলবেগে। পিতৃসম কপিলমুনি তাঁকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। অভিমানী কন্যার খে'ভ

প্রশমিত হল না। মুনির প্রবোধবাক্য না শুনে করে নর্মদা নিচের প্রস্তরখণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তবেই না সৃষ্টি হল জলপ্রপাত কপিলধারা। তারপর আরো পশ্চিমদিকে ছুটতে থাকল দেবী নর্মদা। এদিকে বিবাহবাসরে ছলনার কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। সহচরীর বিবাহ শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে গেল। শোকাহত শোনভদ্রও অস্থির হয়ে পড়ল। ঘর ছেড়ে চলতে লাগল পশ্চিম হয়ে উত্তর দিকে। সেই থেকে কন্যা নর্মদা এবং রাজপুত্র শোনভদ্র কি এক অভিশাপ বহন করে দুদিকে বয়ে চলেছে।

উত্তরবাহিনী শোন নদী মিলিত হয়েছে পতিতপাবনী গঙ্গায়। পশ্চিমমুখী নর্মদা নদী পতিত হয়েছে আরব সাগরে। শুনতে শুনতে ভাবছি কেমন চমৎকার কাহিনীর সঙ্গে কাহিনী জুড়ে এইসব লোককথার সৃষ্টি হয়। পুরাণকথা হয়। কালে তা জনমানসে অবলীলায় মান্যতা পায়। প্রাকৃতিক সৃষ্টি হারিয়ে যায় বিশ্বাসের পুণ্য প্রবাহে।

শোনামুড়া ৩,৪৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। শুরুতে শোন ও ভদ্র নামে দুটি স্রোতধারার উদগম হয়েছে। আসলে মাটি-পাথরের গহ্বর থেকে একাধিক বিন্দুতে উৎসারিত হয়েছে ঝর্ণা। দু'পা এগিয়ে দুটি ধারা মিলিত হয়ে শোনভদ্র হয়েছে। দেখতে পেলাম শোন নদীর উৎস – বাধানো চত্বরে ঘেরা। ভদ্র নদীর উৎস কয়েক হাত তফাতে ঝুপড়ির নিচে একটি স্থানে। মিলিত জলধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি পথে – ছড়ানো উপলশ্রেণি ডিঙিয়ে। তারপর খানিকটা এগিয়ে সটান পতিত হয়েছে নিচের উপত্যকায়। আমরা বাধানো পথে সেই প্রপাত দেখতে গেলাম। ৩৫০ ফুটের মতো জলপতন হয়েছে প্রপাতে। বেশি জল নেই বলে জলপ্রপাত সুদর্শন নয়। তবে এই মাত্র নদীর উৎসরণ আর সামান্য এগিয়ে জলপতন – এমনটা সহসা দেখা যায় না।

প্রপাতের উপর থেকে প্রপাত-দর্শনের জন্য সুব্যবস্থা আছে। সেই ক্যান্টিলিভার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উপর থেকে জলপতনের দৃশ্যটা দেখা যায়। নিচে নামার প্রয়োজন হয় না। পাহাড়ের নিচে সবুজ উপত্যকা – অনেকটা দূর অবধি বিস্তৃত। নিচের উপত্যকা ছাড়িয়ে দিগন্তের ওপারে আবার পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সবুজে মাখামাখি পাহাড়ের অন্তরাল থেকে সূর্যোদয় নয়নমনোহর। তাই এটি চমৎকার সানরাইজ পয়েন্টও বটে।

শোন-উদগমের উপরের ধাপে দুর্গা মন্দির তথা সোনাখ্খি শক্তিপীঠ। ব্রহ্মা ও শৌনক ঋষির তপস্যাভূমি ছিল এই বনভূমি। এখানেও লতাগুল্ম থেকে তৈরী ওষুধের জোরালো বিজ্ঞাপন ছড়ানো চারদিকে। একটি বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

প্রপাত ও মন্দির দর্শন করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছিল। দেখে লোভ সামলানো শকত। পোয়া বারো টাকা। পোয়া মানে যে প্রায় আড়াইশ' গ্রাম এটা তিতলির জানার কথা নয়। বঙ্গীয় জিলিপির মতো আলাদা আলাদা গোলাকার মোটা লাইনের প্যাঁচ নয়। এখানকার জিলিপির প্যাঁচ সরু সরু এবং ক্রমশ পেঁচিয়ে চলে। দোকানী প্যাঁচ ভেঙে প্রয়োজন মতো ওজনে বিক্রয় করে।

চন্দনের সোনাদি কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আলাপ করল। তারা নর্মদা পরিক্রমারত। কেউ তিনমাস, কেউ ছয়মাস, কেউ একবছর ধরে পরিভ্রমণ করছে। বোচকা মাথায় নিয়ে লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়েছে পুণ্যসঞ্চয়ে। পুণ্যস্থানে স্নান, রন্ধনপর্ব এবং আহার। রাত্রি অতিবাহিত হয় কোন-না-কোন ধর্মশালায়। ছয়জন মহিলা ও দুজন পু(ষ – সকলেই বার্ধক্যের পথে। সবথেকে বেশি বয়স রামকো বাঈ-র। আশি। রামপেয়ারীর বয়সও নাকি পঁচাত্তর হবে। অধিকাংশ খাণ্ডোয়া থেকে এসেছে। এ হল সেই ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ। মহাকাশ পবিক্রমায় পুণ্য নেই। পুণ্য নদী পরিক্রমায়। দিবারাত্র কোটি কোটি ভারতবাসী পুণ্য-পুণ্য ভাবনায় মগ্ন। তারা কি এতই পাপী? তাদের প্রসারিত করতলে সামান্য অর্থ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্যান্য দর্শনীয় জায়গা দেখতে। আমরা ওদের মতো পুণ্যার্থী নই, নিতান্ত দর্শনার্থী। চন্দন-শিখারা অবশ্য সেই সুযোগে কিছুটা পুণ্য সঞ্চয়েও আগ্রহী।

একজন বলছিল ফেরার পথে শুকদেবানন্দের আশ্রম দেখতে। ১০৮ মন্দিরের টেম্পল কমপ্লেক্স। আসলে তান্ত্রিক মন্দির। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। পথে পড়ে পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্দির – মার্কণ্ডেয়াশ্রম। শঙ্করাচার্যর উপাস্য দেবতা পঞ্চানন শিব রয়েছেন মন্দিরে। আশ্রমে আরো অনেক মুনিঋষির আগমন ঘটেছিল। আমাদের সে সব দেখার সুযোগ ছিলনা। কারণ সময়াভাব।

গাড়িচালক এরপর আমাদের নিয়ে গেল শ্রীযন্ত্র মন্দির দেখাতে। এটি আধুনিক কালের শৈবমন্দির। মন্দিরগাত্রে অনেক মূর্তি সাজানো। ঐতিহাসিক মূল্য নেই। তবে অভিনব স্থাপত্য-ভাস্কর্য আছে। মূলমন্দির নির্মিত হয়েছে বটে তবে অন্যান্য নির্মাণকার্য চলছে। অনৈতিহাসিক মন্দিরটিকে তেমন আকর্ষণীয় মনে হল না।

পরবর্তী গন্তব্যস্থল ৩২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত কপিলধারা জলপ্রপাত। রামকৃষ(কুঠিরের পাশ দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গিয়েছে পথ। বিড়লা মাইনসের রাস্তা ধরে সাত কিমি এগিয়ে যেতে পড়ল কপিলধারা – যেখানে কন্যা নর্মদা কপিলমুনির নিষেধ

অগ্রাহ্য করে ঝাঁপ দিয়েছিল পাহাড় থেকে। ধারা থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে হল। অবশিষ্ট পথটুকু পদব্রজে যেতে হবে।

পথের দুপাশে ধর্মশালা, চা-জলখাবারের দোকান, পূজাসামগ্রী ও খেলনার দোকান। তীর্থযাত্রীর ভিড় সর্বত্র। স্নান করছে। পূজাপাঠ করছে। রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত কেউ। চারদিকে রাশিরাশি ভিজে কাপড় মেলা হয়েছে। শুকোনোর জন্য। এত জামাকাপড় দেখে ধোবিখানা বলে ভুল হতে পারে। আব্রুর বালাই না রেখে পুণ্যার্থীদের স্নানপর্ব চলছে। মহিলারাই মহিলাদের বেশ পরিবর্তনের জন্য অন্তরাল রচনা করছে। আলুথালু মানুষ-মানুষীর সেসব দৃশ্য এড়িয়ে কপিলধারার নৈসর্গিক ছবি তোলাই দায়।

এখানেও শোনপ্রপাতের মতো জলপতনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের ব্যবস্থা আছে। উপর-তলে দর্শন-স্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নর্মদার বাম তটে। বনভোজনের জন্য অবশ্য আদর্শ জায়গা।

কপিলধারায় নর্মদার একশ' ফুট খাড়া জলপতন। নিচে ধারা-স্নান করছে অনেকে। কমবয়সী ছেলের দল উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচের কুণ্ডে। খেলাধুলায় প্রবল উৎসাহী চন্দনের হাত-পা নিশপিশ করছে সেসব দেখে। জলে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। এদিকে বয়সটাকেও অবহেলা করা যাচ্ছে না। নয়তো ...।

ভকতরা বলে – চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে তারপর আচমকা নর্মদার এই নির্ঝর পতন দর্শনার্থীদের মোহিত করে। চন্দন জানতে চাইল – সত্যি কি নর্মদা অদৃশ্য হয়ে যায়? নর্মদা কি হারিয়ে যায়?

ওপারে যাওয়ার জন্য সেতু রয়েছে। কপিলধারার আরেকটু নিচের দিকে রয়েছে দুগ্ধধারা। যেতে হলে ওপাড় ধরে এগোতে হবে। নেহেরুর চিতাভস্ম এখানে বিসর্জিত হয়েছিল বলে জায়গাটি নেহেরু চবুতরা নামেও পরিচিত।

সেতু পেরিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের সামনে থেকে শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলে কপিলধারার নিম্নতল। বাঁদিকে কপিলধারা রেখে ডানহাতে পথ চলে গিয়েছে ভাটির দিকে। দু-ফার্লং এগোলেই দুগ্ধধারা। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৩০৫০ ফুট। এর নাম দুগ্ধধারা না দুইধারা? কারণ দেখলাম প্রায় ৫০ ফুট উঁচু জলপ্রপাত দুটি ধারায় পতিত হচ্ছে। লোকে বলে – কোন এক সন্ন্যাসী খাকিবাবা দেখেছেন নর্মদার জলধারা কেমন করে ধবল দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধপু(ষ ত্রৈলঙ্গস্বামী আঁজলা ভরে পান করেছেন সেই জল। ঋষি দুর্বাসার গুহা ছিল এই প্রপাতের কাছে। এখনও ঐ নামের একটি গুহা রয়েছে। কেবল প্রবল

প্রতাপান্বিত সেই ঋষি দুর্বাসা নেই। শকুন্তলার হেনস্থার জন্যে মুনি দুর্বাসার উপর জমা খে'ভ দেখছি এখনো গেল না।

দুগ্ধধারা পেরিয়ে নর্মদা আবার নাকি অন্তরালে চলে গিয়েছে। আমাদের চোখে তা ধরা পড়ল না। ধরার চেষ্টাও করিনি।

মহর্ষি ভৃগুর তপোভূমিও এই পুণ্য স্থান। কেউ বলেছিল যে নর্মদা মন্দির থেকে চার কিমি দূরে দখিণদিকে যমুনা-দাদর গ্রামে রয়েছে ভৃগুর কমণ্ডলু। তপস্যারত মহর্ষি একবার তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার সময় নদীতীরে কমণ্ডলু ফেলে চলে যান। তদবধি কমণ্ডলু সেখানে বিদ্যমান। যে প্রস্তরখণ্ড কমণ্ডলু হিসেবে মানা হচ্ছে, তার মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। সর্বদা জলে ভরে থাকে। লোকে বলে সিদ্ধ কমণ্ডলুর জল কখনো শেষ হয় না। এখানে আরো রয়েছে ধুনাপানি, সিদ্ধি বিনায়ক ও চণ্ডীগুম্ফা। আমাদের সেসব দেখা হয়নি।

কপিলধারা থেকে অমরকন্টক ফিরে উত্তরদিকে গাড়ি ছুটল শাহডোল রোড ধরে। বেলা তখন প্রায় বারোটা। এবার যাত্রা ৯ কিমি দূরের জালেশ্বর-মহাদেব দর্শন।

নর্মদা কুণ্ডের জল ঘটে ভরে জালেশ্বর মহাদেবের মস্তকে চড়ানোর কথা খুব করে বলেছিল ঘনশ্যাম। বিশেষ করে শিবরাত্রির দিন এই পুণ্যকর্মের মাহাত্ম্য নাকি অপরিসীম। গোটা শ্রাবণ মাসে পায়ে হেঁটে ভক্ত(রা জালেশ্বর মহাদেবের মস্তকে জল-বর্ষণ করে। কারণ এতদ্বারা জন্মমৃত্যুর পুনরাগমন থেকে মুক্তি মেলে। দুঃখের কথাটি হল – ঘনশ্যামের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আমরা আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। প্রাচীনকালে এখানে জালশ্বের নামের এক সরোবরও ছিল।

পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে অতি সাধারণ শিবমন্দির। সুন্দর না হলেও মাহাত্ম্যে অসাধারণ। ভূমিতল থেকে সামান্য নিচে গৌরীপট্টে সমাহিত শিবলিঙ্গ। অনুমানে বুঝলাম – বাইরে যিনি চেয়ারে বসে আছেন তিনিই মহান্ত নাগাবাবা নরেশ পুরী। আমাদের সাদরে আহ্বান করে পাশের চেয়ারে বসতে দিলেন। শীতল জলপান করালেন। জালেশ্বর মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি পুস্তিকা দিলেন পড়তে। হিন্দিতে লেখা। জানালেন – অনতিদূরে রয়েছে জালোহা নদীর উদগম।

চন্দন জালোহা তথা জালেশ্বর নদীর উৎস দেখতে খানিকটা এগোল বটে তবে বোঝা গেল পাহাড়-অরণ্যে ঢাকা সেই জলপ্রবাহ বেশ খানিকটা দূরে। আমাদের খোঁজ করার মতো সময় নেই। শুনেছি জালোহা নদী বান্ধবগড়ের কাছে শোন নদীতে মিলিত হয়েছে।

একদল বেদে নাগাবাবার কাছে বসে বীণ বাজাচ্ছিল। আরণ্যক পরিবেশে বীণের ধ্বনি আবেশ ছড়াচ্ছিল। জঙ্গল থেকে ধরে আনা সাপ সাপুড়েদের ঝাঁপিতে। আমাদের বলল – শিবরাত্রির পুণ্য দিবসে শিব-ভূষণ ঐ সরীসৃপ প্রাণীটিকে ছুঁয়ে দেখতে। ও কর্মটি করতে আমি তো রাজি নইই। অন্যেরাও কেউ রাজি হল না। নাগাবাবাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সবশেষে দেখা হল সর্বোদয়তীর্থ। এটি জৈনমন্দির। অবস্থান অমরকন্টকের খুব কাছে। আমরা ট্যুরিস্ট হোম থেকে বিশাল একটি ক্রেন দেখেছিলাম। ভেবেছি কোন কারখানা টারখানা আছে ওদিকে। ওই ক্রেন যে মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝিনি। নির্মাণরত মন্দির দেখতে সকলেই খুব আগ্রহী হয়ে উঠল। একদিন এই নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে আমরা গর্বভরে বলতে পারব – আজ এই যে মন্দির দেখছ, একে আমরা একদিন একটু একটু করে তৈরি হতে দেখেছি। তিতলির উপর দায়িত্ব রইল পরবর্তী প্রজন্মকে সেকথা জানানোর। আমাদের জীবদ্দশায় সুযোগটা না মিলতেও পারে কিনা!

ভূমিতল থেকে মন্দিরের অধিষ্ঠান পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তখন। ধাপে ধাপে ভূমি থেকে মন্দির উচ্চতায় উঠেছে। জগতির উপরে স্তম্ভ বসানোর কাজ চলছে। চারদিকে ঈষৎ বাদামী রঙের রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো। পাথর কাটার কাজ চলছে। কোথাও শিল্পকর্ম-অলঙ্করণ চলছে। অসমাপ্ত খোদাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দিনটা রোববার বলে আমরা শিল্পীদের কর্মরত দেখতে পেলাম না – সেটা একটা বড়ো আফশোষ রয়ে গেল।

অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত প্রথম জৈনগু(আদিনাথের দশ ফুট উঁচু মূর্তিটি গর্ভগৃহের যথাস্থানে বসানো হয়েছে। ওজন চব্বিশ টন। সামনে বিশাল সভাঘর ও প্রবেশঘর নির্মিত হচ্ছে।

মন্দির দেখে বোইরে এসে এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। কে যেন বলে উঠল ভাঙা বাংলায় – আপনারা কোলকাতার লোক না?

তাকিয়ে দেখি এক মাঝবয়েসী দোকানি। বিদেশে মাতৃভাষা শুনতে পেলে কার না মন ভালো হয়! বললাম – হ্যাঁ, কিন্তু আপনিও বাঙালি নাকি?

– না না, আমি বাঙালি নয়। তবে অনেকদিন বাংলায় ছিলাম।

দোকানির আলাপচারিতার আসল উদ্দেশ্য অন্য। বলা বাহুল্য বিক্রয়াদি। সওদাগর সওদার রাস্তা খুঁজবে সে আর বিচিত্র কী। আপ্-ুত হয়ে কেনা হল টুকিটাকি।

অমরকন্টকে দর্শনীয় তালিকায় রয়েছে আরো অনেক কিছু – যেমন, তান্ত্রিক মন্দির, রুদ্রগঙ্গার উপর রুদ্রগঙ্গা প্রপাত, শম্ভুধারা, দুর্গধারা ইত্যাদি। ১২০ ফুট উঁচু থেকে পড়ছে নাকি ওই শম্ভুধারা প্রপাত। সব কি আর দেখা সম্ভব হয়? হয় না।

বিকেলে ঘুরতে বেড়িয়ে দেখা হল কল্যাণ আশ্রমের চোখ ধাধানো বৈভব। মেলা এখন ভাঙা হাট। কিছু লোকজন আছে। দোকান-পসরা অধিকাংশ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। কাল কি জমজমাট ছিল আজ ভাঙা হাট। অমরকন্টকে মেকলে পাহাড়ের শীর্ষে কপিলধারা রোডে এম-পি-টি-ডি-সির ট্যুরিস্ট বাংলোর ঘর ছিল নাকি ১৯০ টাকায়। এখনও আছে কিনা জানা হয়নি। প্রাইভেট হোটেল প্রিন্স কটেজ, শ্রীরাম ট্যুরিস্ট লজ, নর্মদা লজ। খাদ্যে বাঙালিয়ানা মেলে শ্রীমাতা সদন ও মহাবীর ভোজনালয়ে। হোমের রেস্তোরা ছেড়ে তা আর যাচাই করা হয়নি।

পরদিন সকলে আমরা অমরকণ্টক থেকে বিদায় নিলাম।

৩।

গতকাল রাতে ফোন করে বলা হয়েছিল ঘনশ্যাম যেন সকাল আটটার মধ্যে বিলাসপুর থেকে গাড়ি নিয়ে আসে। আমরা অমরকন্টক থেকে ফিরব। ঘনশ্যাম কথা রেখেছিল। সওয়া আটটার মধ্যে রওনা দিতে সমস্যা হয়নি। সোজাসুজি বিলাসপুর যাব না। ভোরমদেও হয়ে যাব।

জায়গাটার কথা প্রথম শুনেছিলাম ঘনশ্যামের কাছে। প্রথম দিনই বলেছিল – বিলাসপুর থেকে কিছু দূরে ছত্রিশগড়ের খাজুরাহো নামে এক মন্দির আছে, নাম ভোরমদেও মন্দির।

খাজুরাহো সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা সুবিদিত। তার আবার মিনি চেহারা আছে বলে তো কখনো শুনিনি। না, এ রকম মন্দিরের নামই শুনিনি কখনো। চন্দন তখনই বলেছিল – কিভাবে যেতে হবে সেখানে পাত্তা লাগিয়ো তো। ঘনশ্যাম খবর এনেছিল। সেইমতো আমরা ভোরমদেও হয়ে বিলাসপুর যাব। পথঘাট আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা। একশ' ভাগ নির্ভর শ্রীমান ঘনশ্যামের উপর।

অমরকন্টক থেকে ৫ কিমি সামনে রয়েছে ৩৪০০ ফুট উচ্চতায় কবীর চবুতরা। কবির গেট থেকে পথ নেমেছে মন্দিরে। ধর্মে মুসলমান পেশায় তাঁতি-জোলা মহাত্মা কবির রামনামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তাঁর সাধনখেত্র ও সিদ্ধিলাভ খেত্র ।পাদুকা রয়েছে মন্দিরে স্মৃতিচিহ্(হিসেবে। রয়েছে দুধধারা। অগভীর জলের কুণ্ড। তার মধ্যে

মাঝে সাদাটে রেখা দেখা যাচ্ছে। ভক্তরা আপ-ুত তা দুধধারা রূপে শনাক্ত করে। ভক্ত মানুষের মন কত সরল! অজ্ঞানতার সারল্যে বিভোর। নাকি কিছু চতুর মানুষ এদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে থাকে?

কবীর ১৪শ শতকের শেষ থেকে পরবর্তী শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শোনা যায়, তিনি ছিলেন কোন ব্রাহ্মণী বিধবার সন্তান। পরিত্যক্ত শিশুকে পালন করেন নীরু নামের জনৈক মুসলমান তাঁতী। বড়ো হয়ে কবির পালক পিতার পেশা গ্রহণ করেন। গুরুপদে বরন করেন রামানন্দ স্বামীকে। কাশীধামে বসবাস কালে সাধুসন্তদের সংস্পর্শে এসে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। কবির রচিত দোঁহা ভকিত ও সাহিত্যজগতের অমূল্য সম্পদ। প্রেমময় ভকিতই তার মুখ্য দিক।

কবির চবুতরা দেখে এগিয়ে গেলাম। পথে পড়ল ধুনিপানি নামের উষ(জলের প্রস্রবণ। না দেখেই এগিয়ে গেলাম। কাঁওচিতে প্রাতরাশ হল মশলাদোসা দিয়ে। নেমে এলাম ছাপারিয়া অবধি। ৫৪ কিমি ড্রাইভ করে। এবার ডান হাতে অরণ্যপথে প্রবেশ করতে হবে সর্টকাট করতে। সামনে গেট। জঙ্গলে প্রবেশ করতে হলে নামধাম লিখতে হয়। গাড়ি থেকে নেমে যেতে যেতে চন্দনকে ঘনশ্যাম বলল – ইহা পর আপকা দেশকা আদমি হ্যায়, মিল লিজিয়ে।

ছত্রিশগড়ের জঙ্গলে এসে বঙ্গভাষীর দেখা পাওয়া যাবে এমনটা ভাবা যায়না। বয়স্ক হাড়-জিরজিরে চেহারার ফরেস্ট গার্ডের নাম অমরেশ চত্র(বর্তী। বাংলা প্রায় ভুলতেই বসেছে। কথায় কথায় হিন্দি বুলি এসে যায়। আলাপ জমল না। পঞ্চাশ টাকা জমা করে বনপথে চলার অধিকার মিলল।

এবার গতিমুখ খুড়িয়ার দিকে। জঙ্গলে নাকি অনেক বন্যপ্রাণী বসবাস করে। কপাল ভালো থাকলে দেখা মিলতেও পারে। যদিও এটা শীতের সময় এবং দিবালোক। নিশাচর প্রাণীদের বিশ্রামকাল। তবু মানুষের মতো প্রাণীরা কি ভুল করে কখনো নিয়মভঙ্গ করে না? বাঘ বা চিতার দেখা পাওয়া একবারে অসম্ভব নয়। তিতলিকে বললাম – গাড়ির কাঁচ উঠিয়ে দেবে কি না ভেবে দেখ।

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ও গাড়ির কাঁচ তুলে দিল। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা কাঁচা পথ ধরে এগেচ্ছি। এক একটা জঙ্গল পার হচ্ছি। একখণ্ড দ্বীপের মতো আদিবাসী গ্রাম পড়ছে। আবার জঙ্গল। একাগ্রচোখে বন্য জন্তুর তালাশ চালিয়েও লাভ হল না। বান্দর ও হনুমান ছাড়া আর কারো দেখা মিলল না।

পৌঁছে গেলাম খুড়িয়া বাঁধ। বৃটিশ আমলের তৈরী বাঁধ। অথবা আরো আগের। বর্তমানে নাম বদলে রাজীব গান্ধী জলাধার। পরিচিতি প্রাচীন নামেই বেশি। নতুন নামকরণ ব্যবস্থায় বেজায় চটে আছে ঘনশ্যাম। বলল – ইহা পর সবকুছ ইন্দিরাজি অউর রাজীবজী কা নাম পর রাখ্খা গিয়া। চিফ মিনিস্টার কো ইন্দিরা-রাজীব কি সিবা অউর কোই নাম নেহি মিলা।

বুঝলাম আমাদের ঘনশ্যাম ইন্দিরা কংগ্রেস-বিরোধী। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী হালের নির্বাচনে পরাস্ত। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির কেউ।

২৩ কিমি দূরে গিয়ে পেলাম খুড়িয়ার রেস্ট হাউস। ইরিগেশন ক্যানেলের পাড় ধরে এগোচ্ছি। গেটে গাড়ি আটকাল প্রহরী। আর এগোনো যাবে না। সামনে এগিয়ে যেতে জঙ্গলের গেটপাশ যথেষ্ট নয়। অনেক অনুরোধ উপরোধে অবশেষে গেট খুলে দিল সরকারী কর্মচারীটি। ঘনশ্যাম বলল – দশ রূপেয়া দিয়ে দিন উনকো চায়ে পিনে কে লিয়ে।

সেকথা শুনে বিব্রত প্রহরী বলল – আমি তো মাইনে পাই। ফির এই জঞ্জাল কেন দিচ্ছেন?

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই দরিদ্র গ্রাম্য প্রহরী বলছে জঞ্জাল? আরে ভাই, এই জঞ্জালের জেরে গোটা ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। শুধু ভারতই বা বলি কেন, এ জঞ্জাল দুনিয়ার কোথায় নেই? অমন ঈশ্বরের মতো সর্বশকিতমান ধনবান আমেরিকা, সেও কি জঞ্জালমুকত? স্বর্গের দেবদেবীরা এই জঞ্জালেই পরিতৃপ্ত হয়ে ধা করে বর বর্ষণ করেন না?

৯৬ কিমি দূরে পড়ল খামহি। ভোরমদেও আরো ৬৫ কিমি দূরে। এবার আমরা পাকা সড়কে উঠে পড়েছি। আরো ২৭ কিমি এগিয়ে পান্ডারিয়া। দূরের পাহাড়তলিতে কোথাও রয়েছে অচেনা অজানা ভোরমদেও। ঘনশ্যাম সময় ও দূরত্ব বাঁচাতে গ্রামের পথে গাড়ি নামাল। পনেরো বছর আগে এসেছিল একবার – সেই স্মৃতি ভরসা করে।

কিছু(ণ কাঁচা রাস্তায় চলার পরে খেতখামারে দিশাহারা হয়ে গেলুম। মনে হল যেন অনাবশ্যক ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে মরছি। আমরা তখন ভাবতে বসেছি – ড্রাইভার ঘনশ্যামের কথায় এরকম অজ্ঞাত জায়গায় ভেসে যাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে? ব্যাপারখানা পুরো ফ্লপ শো না হয়ে যায়! বেশি উৎসাহ ছিল চন্দনের। ফ্লপ হলে ঝাড় আছে ওর কপালে। চাঁদা করে চাটি পড়বে মাথায়। চন্দন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল ড্রাইভারের পাশে।

আমরা তখন খেত ছেড়ে পাকা সড়কে উঠতে ব্যগ্র। ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছি। স্কুল পড়ুয়ারা জানিয়ে দিল কোন রাস্তায় গেলে পাকা সড়কে ওঠা যাবে। সঠিক পথনির্দেশ। এসে গেল পৌরি। এবার জাতীয় সড়ক-১২এ ধরে যাচ্ছি। এসে গেল কবর্ধা। এখানকার রাজাই বর্তমানে ছত্রিশগড় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

কবর্ধার একটু আগে মূল সড়ক থেকে ডাইনে ঘুরে গিয়েছে ভোরমদেওর রাস্তা। কবর্ধা থেকে ভোরমদেও ১৬ কিমি পথ। একটু এগিয়ে রাজানয়াগাঁও – হাঁট বসেছিল সেদিন। হাঁট ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ভোরমদেও ঢুকতে এক জায়গায় দশ টাকার পথকর দিতে হল।

বাইরের প্রকৃতি এখানে অন্যরকম। পরপর অনেক পাহাড় ছড়ানো। ঘন সবুজ বন কেমন রুক্ষতায় বদলে গিয়েছে। লোকজন চোখে পড়ছে না তেমন। রোদের ঝাঁজ বেশ। সকাল সাড়ে আটটায় অমরকন্টক ছেড়েছি। এদিকে বেলা আড়াইটে বাজে। পছন্দমতো খাওয়ার দোকান পাওয়া যায়নি বলে কলা-বিস্কুট-চিড়েভাজায় লাঞ্চ সারা চলছে। সকলে ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন।

অবশেষে পৌঁছনো গেল ভোরমদেও। অমরকন্টক থেকে ১৬৩ কিমি রাস্তা ঠেঙিয়ে। চারদিকটা অনুচ্চ পাহাড়ে ঘেরা। ঘন সবুজ বন নয়, কাঁটাগুল্মভরা ঝোপঝাড়ই বেশি। জনমানবহীন বিজন প্রান্তর। রাখ'স-খোক্কস বসবাসের আদর্শ জায়গা। ধারেকাছেই দণ্ডকারণ্য হবে বোধ হয়। দূর পাহাড়ের চূড়োয় সাদামাটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ওটা যদি ভোরমদেও মন্দির হয় কবে, তো সব পরিশ্রমই ব্যর্থ।

গেট পেরিয়ে লাল মোরামে ঢাকা পথ। ডান হাতে বিশাল জলাশয়। ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগলাম। একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম – এখানে মন্দির আছে কোথায়?

– ঐ তো সামনে এগিয়ে বাঁহাতে।

– মন্দিরে মূর্তি আছে?

– হ্যাঁ, অনেক আছে। এত আছে যে একমাস ধরে দেখেও শেষ করতে পারবেন না।

বলে কী! এত মূর্তি আছে এখানে এমন অখ্যাত জায়গায়? একটু এগোতেই বাঁহাতে পড়ল প্রাচীর ঘেরা বিশাল চত্বর। বাইরে পূজোর সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। চত্বরের ভিতরে ঢুকে চোখ ছানাবড়া। চন্দনকে বললাম – না, ফ্লপ শো নয়। সত্যি একে মিনি খাজুরাহো বলা যায়। খাজুরাহোর মতো অত বড়ো কিছু নয় বটে, তবে ধরণটা ওরকমই।

আদিবাসীদের এক দেবতার নাম ভোরম, তাঁর নামে মন্দিরের নাম ভোরমদেও। ভোরম দেবতা তাহলে শিব নয়? অথচ আমরা দেখছি মূলমন্দিরে পূজিত হচ্ছেন শিব। ভৈরব ও ভোরমের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? ইতিহাস বলে – ১১শ শতকে নাগ বংশীয় রাজা রামচন্দ্র দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। একজন বলল – নাগ বংশের যে রাজা মন্দির নির্মাণ করেছেন তার নামটাই ছিল ভোরমদেও।

প্রশস্ত চত্বরে ডানহাতে প্রথমে একটি ভাঙা মন্দির তারপর প্রস্তর নির্মিত ও কা(কার্যময় মূলমন্দির। বাঁহাতে চারদিক খোলা ছাউনির নিচে অনেক মূর্তি সাজানো। চারদিকের প্রাচীর বরাবরও অজস্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সারি সারি সাজানো রয়েছে।

পূর্বমুখী মন্দির নাগর স্থাপত্যের নিয়মে রচিত। গর্ভগৃহ, অন্তরাল এবং মণ্ডপ রয়েছে। মণ্ডপের তিনদিকে মাঝামাঝি অংশে যুক্ত তিনটি বারান্দা তথা প্রবেশদ্বার। ভূমি থেকে মন্দির ফুট চারেক উঁচুতে হবে। পীঠের এই উচ্চতা ছয়টি মোল্ড-করা সারিতে বিভক্ত। উপরের সারিতে পশু মূর্তি – সুন্দর হাতির সারি।

গোটা ছয়েক সিঁড়ি ভেঙে পূর্ব-উত্তর-দখিণের যে কোন একটি বারান্দায় উঠে তারপর মণ্ডপে প্রবেশ করা যায়। বারান্দা খোলা নয়, কোমর সমান উঁচু প্যারাপেট দেয়ালে ঢাকা। বাড় অঙ্গের পাভাগ পর্যন্ত। সামনের দিকে দুপাশে একজোড়া করে স্তম্ভ। পর্যায়ত্র(মে চতুষ্কোন ও গোলাকার। এবং সবটাই অলঙ্কৃত। উপরে পাথুরে বিম। তার উপরে ঢালু কার্নিস। বাঁদিকের (দখি ণ) বারান্দায় শিলালিপি রয়েছে দেখলাম।

ভিতরে ঢুকলাম। চতুষ্কোণ মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চারটি করে স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। মোট ষোলোটি স্তম্ভ রয়েছে। হলের মধ্যভাগে চারটি স্তম্ভ আর বাকি বারোটি স্তম্ভ চারধারে। মণ্ডপ থেকে অন্তরালে যেতে হলে বাড়তি দুটো স্তম্ভ অন্তরালের প্রবেশমুখে।

গর্ভগৃহে গৌরীপট্টে শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। তাঁর মাথার উপর তামার দুটি নাগমূর্তি। চারপাশে আরো কিছু প্রস্তরমূর্তি রাখা হয়েছে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য। যেমন গণেশ, পার্বতী। পুরাতত্ত্ব বিভাগ জোর কদমে মন্দির সংস্কার করছে। মন্দিরের মেঝেতে গে-জ্‌ড্‌ টালি বসাচ্ছে। এ ব্যাপারটা ভারতীর কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগল। মন্দিরগৃহে পাথরের মেঝেই মানায়। মার্বেল পাথর না হোক, বেলেপাথরের মেঝে তো হতে পারত। একবিংশ শতকের ঝা-চকচকে যুগে প্রাচীনপন্থী এজাতীয় ভাবনা অবশ্য আমল পায় না। তাই সেখানে গে-জ্‌ড্‌ টালি বসে।

মূলমন্দিরটির নকশা পঞ্চরথ না সপ্তরথ আদলের তা নিয়ে খটকা থেকে গেল। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে উত্তর-দখিণ-পশ্চিমের তিন দিকে রাহাপাগ। প্রত্যেক

রাহাপাগের দুধারে তিনটি করে খাঁজ। কোণার খাঁজটিকে কোণাপাগ বলে। অর্থাৎ এটি সপ্তরথ শ্রেনির মন্দিরই হবে। তিন রাহাপাগের কুলুঙ্গীতে তিন থাকে তিনটি করে পার্শ্বদেবতা রয়েছে। শিব, পার্বতী, গণেশ, বিষু(, হনুমান ইত্যাদি। সবই কালো পাথরের মূর্তি। মন্দিরটি ধূসর বেলেপাথরের।

মন্দিরশিখর উড়িষ্যা রীতি অনুসারে রেখদেউল রীতির। খানিকটা সোজা উঁচু হয়ে উঠে তারপর ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। কিন্তু উড়িষ্যার মতো কোণাপাগে বা অনুরথপাগে ভূমি-আমলা নেই। তার বদলে দেখছি স(-মোটা ভুট্টার মতো দানাদার অলঙ্করণ সারি সারি। নিচ থেকে উপরের আমলকে উঠে গিয়েছে। ভারতী বলল – মফচেনের ডিজাইন। দুই রাহাপাগের মধ্যে পাঁচছড়া মফচেন যেন। শীর্ষে গোলাকার আমলক রয়েছে। তার উপরে খাপুরি ও কলস থাকার কথা। নেই। শিখরের সম্মুখভাগে অন্তরালের ছাদের উপরে শুকনাসিকার মতো কিছুটা মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। সেখানে চৈত্য-অলঙ্করণ।

বারান্দার সম্মুখভাগ কার্নিসের বেশ খানিকটা উপর পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। দুদিকে জলনিকাশের জন্য দুটি মকরমুখ। মণ্ডপ ও অলিন্দ জুড়ে নির্মিত ছাদ সমতল মনে হচ্ছে।

বারান্দার দুপাশে মণ্ডপের খাড়াই দেয়াল দৃশ্যমান। কার্নিস নেই বলে সোজা ছাদ পর্যন্ত উপরে উঠে গিয়েছে। পাভাগের উপরে সমান্তরাল তিন সারিতে এবং তিন খাড়াই ভাগে মূর্তি রয়েছে। মূলমন্দির ও অন্তরালের খাঁজেখাঁজেও ভাস্কর্য। বাড়ের পাভাগে গোটা চারেক মোল্ডিং। জঙঘাদেশে ও বরণ্ডীতে তিন সমান্তরাল স্তরে বিন্যস্ত দেবদেবী ও অন্যান্য মূর্তি। শিবের মূর্তিই বেশি। শিবের অন্ধকাসুর বধের দৃশ্য আছে। পার্বতী আছে। অজস্র কামচিত্র খোদিত রয়েছে। রয়েছে বংশীবাদিকা, মৃদঙ্গবাদিকা, ও নৃত্যাঙ্গনার মূর্তি। ধনুর্ধারী সৈনিক, মল্লযুদ্ধ ও যুদ্ধের চিত্র। ভাস্কর্য খাজুরাহোর মতো সূক্ষ্ম ও অনবদ্য নয়। মূর্তি আকারে ছোট এবং নিপুনতায় খাটো। খ'য়খ'তিও হয়েছে অনেক। তবু ভালো লাগল। বেশ ভালো লাগল। বিশেষ করে এই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে, এই রুক্ষ আদিমতার মধ্যে এমন শৈল্পিক প্রকাশ অভিভূত করার মতো।

মূল মন্দিরের বাঁপাশে ইটের ভাঙাচোরা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এটি প্রাচীনতর নির্মাণ। আনুমানিক নির্মাণকাল ৮ম শতক। সাধারণভাবে ইঁটের হলেও স্তম্ভ ও উপরকার লিন্টেল-বিম পাথরের। মন্দিরটি তারার মতো নক্সায় নির্মিত হয়েছিল।

বাইরের চত্বরের চারদিকের প্রাচীর ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা মূর্তি। হাতে বেশি সময় নেই। এক ঝলক দেখার চেষ্টা করলাম। মাঝে চালা-ছাদের নিচে আরো মূর্তি রয়েছে। এসবের অনেকটাই নিকটবর্তী চৌরা গ্রাম থেকে সংগৃহীত। ভাস্কর্যের ধরণ থেকে পুরাতত্ত্ববিদগণের অনুমান মূর্তিসকল ১২শ থেকে ১৫শ শতকের কীর্তি। প্রায় পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে আরো নানা পুরাকীর্তি। তার মধ্যে মান্দওয়া ও মদনমঞ্জরি প্রাসাদ রয়েছে। প্রাসাদের গায়েও নাকি খাজুরাহোর মতো ভাস্কর্য। ভোরমদেও মন্দির শঙ্করী নদীর তীরে। কিন্তু নদীর কথা কেউ জানাতে পারল না।

বিলাসপুর ফিরতে হবে। সুতরাং প্রচুর সময় হাতে নিয়ে ভালো করে মূর্তি দেখা সম্ভব হল না। তাছাড়া খিদে ও পরিশ্রমে ক্লান্তও বটে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভোরমদেও একটি সুন্দর পর্যটক কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

পড়ন্ত বিকেল। এবার ফেরার তাড়া। ভোরমদেও যেন আমরা আবিষ্কার করে বিজয়ানন্দ অনুভব করছি। চন্দন এই আবিষ্কারের বেশির ভাগ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। পায়ে পায়ে আবার জলাশয় বাঁহাতে রেখে পাকা সড়কে উঠে গেলাম। এই জলাশয়ের নাম কি দেবাংশী তালাও ? গাড়ি ওখানে অপে(া করছিল। গেটের বাইরে পানবিড়ির দোকান আছে। খাবারের দোকান নেই। একটু চা পর্যন্ত জুটল না।

গাড়ি হাঁকিয়ে ৩০ কিমি দূরে পৌরি চলে এসেছি। সেখানেও পছন্দমতো কিছু পাওয়া গেল না। পৌরি থেকে অন্য রাস্তায় বিলাসপুর যাত্রা করলাম। পথ দূরত্ব ১০৫ কিমি।

পৌরির একটু আগে নতুন চিনিকল বসেছে – রামহেপুর-বুধওরায়। সেখানে রামকুমার অগ্রবালের গুপ্তা ভোজনালয়ে সদ্য সিঙাড়া ভাজা হয়েছে। দেখে লোভ সম্বরন করা মুস্কিল। দোকানদার দোকনের পিছনের দিকে শহুরে বাবু-বিবিদের জন্য স্পেশাল বসার ব্যবস্থা করল। সিঙ্গারার পর উনুনে ভাজা হচ্ছে আলুবড়া। স্বাদ না চেখে উপায় নেই। এদিকে চন্দন তিনদিন পরে মুরগীর ডিম দেখে আত্মহারা। অমরকণ্টক থেকে একটানা নিরামিষী অধ্যায় শেষ করতে বদ্ধপরিকর। দোকানদারকে বলল অমলেট ভাজতে আর মাথাপিছু দুখানা করে (টি বানাতে। তারপর জোড়া (টির মধ্যে অমলেটের ফালি পুরে রোল বানিয়ে ফেলল। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল – অ্যায়সা খানা বানায়া কভি ?

তাজ্জব দোকানদার মাথা নেড়ে জানাল – কভি নেহি।

বিলাসপুর পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে হোটেল গীতায় আড়াইশ' টাকায় ভালো ঘর জুটিয়ে দিল ঘনশ্যামই। সারাদিনে ৪২৯ কিমি জার্নি হয়েছে। ঘনশ্যামকে কিমি পিছু সওয়া পাঁচটাকা হারে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হল। আগামিকাল বিলাসপুর দর্শন করাতে গাড়ি নিয়ে আসবে। সকাল নটার পরে।

৪।

একদা দখিণ কোশল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ছত্রিশগড়। রাজ্যের রাজধানি রায়পুর। বিলাসপুর জেলা-নগর। সদ্যনির্মিত রেলওয়ে জোনের হেডকোয়ার্টারও এখানে। বিলাসপুরে অনেক প্রবাসী বাঙালীর বাস। কবিগু(রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত স্থানও যে রয়েছে এখানে সেটা জানা ছিল না। ১৯১৯ সালে বিলাসপুর রেলওয়ে-বিশ্রামাগারে বসে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ফাঁকি কবিতাটি। সেকথা স্মরণ করে স্মারক নির্মিত হয়েছে এক নম্বর প-াটফর্মে।

শহরের কোনিতে রয়েছে কোনি রামকৃষ(আশ্রম। দুটি কালিমন্দির, জগন্নাথ মন্দির, রামমন্দির, বালাজি মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর মিলন মন্দির, অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ মন্দির। আছে ১৯২০ সালে গড়া প্রবাসী বাঙালীদের ক্রিয়াকলাপ।

রেলস্টেশন থেকে দু-তিন কিমির মধ্যে দু-তিনশ' টাকায় পাওয়া যায় হোটেল শ্যামা, আনন্দ, রাজ, মহুয়া, সেন্ট্রাল পয়েন্ট, নটরাজ, চন্দ্রিকা ইত্যাদি। সবথেকে কাছে হোটেল শ্যামা। হোটেলগুলোর অবস্থান লিঙ্করোড, ঘোলবাজার, সদরবাজার, গান্ধীচক, নিউবাসস্ট্যাণ্ড, শিব টকীজ, তেলিপাড়া, শনিচরী এলাকায়। শহরের মধ্যস্থলে অর্পা নদী। জলপ্রবাহ নেই। ঘনশ্যাম বলল – অন্তসলীলা নদী এটি। নদীতটে দেখছি শশার চাষ হচ্ছে। আরো কিছু ফলন হয় মনে হল।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ(দেবের জন্মদিবস। কোনির রামকৃষ(আশ্রমে তাই পূজা, যজ্ঞ ও ভোগের আয়োজন হয়েছে। শহরের বাঙালিরা সমবেত হয়েছে। অমরকন্টকের স্বামীজীই এখানকার সেত্রে(টারী। কোলকাতা থেকে এসেছি বলে আমাদের কোন অভ্যর্থনা জুটল না। দুটো কথা বলতেও এগিয়ে এল না কেউ।

বিলাসপুর থেকে উত্তরদিকে ডানহাতে সড়ক গিয়েছে। ২৫ কিমি দূরে রয়েছে ইতিহাস নগরী রতনপুর। ছড়িয়ে রয়েছে মন্দির-মসজিদ ও প্রাসাদ।

ঘনশ্যাম বলছিল হাজার বছরের পুরোনো এক মন্দিরের কথা। নির্মাতা রাজা প্রথম রত্নদেব। দর্শন করা হল সেই মহাজাগ্রত মহামায়া মন্দির। মহাকালী, মহাসরস্বতী

ও মহালক্ষ্মীর মূর্তি আছে। বিশাল এলাকা জুড়ে মন্দির। সড়ক থেকে মন্দির দ্বার পর্যন্ত এমন দীর্ঘ ছাউনি আর কোথাও দেখিনি। দুধারে অনেক পূজাসামগ্রী বিত্রে(তার দোকান। রয়েছে ফুচকা-আলুকবলি-চাট-ভেলপুরির দোকান। ডানহাতে বড়ো জলাশয়ে প্যাডল বোটের ব্যবস্থা আছে। বাঁহাতে মন্দির। অনেক পূজারী। তবু পাণ্ডাদের উৎপাত নেই। মন্দিরের পিছনে আরেকটি সুন্দর বাগিচায় পঞ্চমুখী শিবমন্দি র রয়েছে। চন্দন বলল – পুকুরপাড়ে প্রাচীন মন্দির রয়েছে দেখেছো?

অল্প দূরে পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থিত রামটেক মন্দির। পূজিত হচ্ছেন রামসীতা। আমাদের কাছে সাধারণ মন্দির মনে হলেও জনগণের বিশ্বাস এই মন্দির নির্মাণ করেছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এমন কিছু আহা-মরি মন্দির নয় যে খোদ বিশ্বকর্মাকে হাত লাগাতে হবে। তবু গৌরব-বর্ধনে এই প্রচেষ্টা। মন্দিরে সযত্নে রাখা এক জোড়া পাদুকা আছে এবং তা নাকি স্বয়ং রামচন্দ্রের। পূজারী জানাল। যে রামচন্দ্র আসলে কবিকল্পনা, তাঁর আবার পাদুকা! এ তথ্যে ভকত ঘনশ্যামেরও দেখলাম বেশ সংশয় আছে। মন্দিরের দ্বার খুললে প্রথমে রামসীতার মূর্তি দর্শন করবেন একথা ভেবে গর্ভগৃহের বিপরীত প্রান্তে রতনগড়ের রাজা শ্রী বিম্বাজী রাও ভোঁসলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অনুচ্চ পাহাড়টিলা থেকে রতনপুরের দৃশ্যাবলী খুব সুন্দর। অজস্র জলাশয়। সবুজ গাছপালা। পাহাড়। রোদের তেজ ভালোই। কিন্তু ছায়ায় রয়েছে ঠাণ্ডা আমেজ। আগে পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে হত। এখন গাড়ি উঠে আসছে। পাহাড়ের নিচে হনুমান মন্দির। এও এক সিদ্ধপীঠ। ঘনশ্যামকে জিজ্ঞাসা করলাম – সিদ্ধ বলা হচ্ছে কেন?

ও জানাল – সিদ্ধ কথার মানে হল যেখানে প্রার্থনা জানালে ভক্তের মনোকামনা সিদ্ধ হয়। তার্কিকেরা অবধারিত প্রশ্ন তুলবে – দেবতারা কি তবে বেছে বেছে কিছু দেবালয়ে ভকতকামনা সিদ্ধ করেন? এসকল কূটতর্ক অনুচ্চারিত রয়ে গেল। বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে অমর্যাদা করে কোন লাভ নেই। বরঞ্চ সমূহ খ'তি। তর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে ধৈর্যধারণ অত্যাবশ্যক।

হনুমান মন্দির দেখে বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম খুঁটাঘাট বাঁধ দেখতে। এটি বিশাল জলাধার। পিকনিকের সুন্দর পরিবেশ আছে। বিলাসপুর-অমরকন্টক সড়ক পথের উপর খুঁটাঘাট। প্রাচীন নাম বদলে সঞ্জয় গান্ধী জলাশয় রাখা হয়েছে। জলাশয়ের মাঝখানে একটি দ্বীপ আছে। বাঁধের নিকাশী নালা থেকে জল বয়ে যাচ্ছে দূরের খেতখামারে। এদিকে রোদের তেজটা প্রবল হয়ে উঠেছে।

ফেরার পথে রতনপুর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা হল। ঘনশ্যামের ওই খণ্ডহরের সামনে গাড়ি থামাতে ইচ্ছে ছিল না। দেখার মতো কিছু নেই। আমরা জোর করলাম – খণ্ডহর হোক আমরা নামব।

বেজার মুখে গাড়ি থামাল। প্রবেশ পথের বাঁহাতে একটি মন্দির পড়ল। এত মন্দির দর্শন করা সম্ভব নয় বলে এড়িয়ে গেলাম। সামনে গড়প্রাসাদের প্রবেশদ্বার। কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কাজকর্ম করছে সেখানে। প্রত্যেক পাথরে নম্বর লিখে রেখেছে। চওড়া দেয়ালের মধ্যে উপরে ওঠার গোপন সিঁড়ি। পাশে ভাঙা মন্দির। ভগ্ন প্রাচীর। ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ থেকে কোনটা কি ছিল, সেসব কিছু বুঝে ওঠা এখুনি সম্ভব নয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ হয়তো শীঘ্র খনন করবে। তখন তারা উদ্ধার করবে ঐতিহাসিক তথ্য। রামচরণ কুরিয়া নামের একজন পুরাতাত্ত্বিক কর্মীকে চন্দন যোগাড় করে ফেলেছিল। সেই উৎসাহভরে আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাল।

পঞ্চভুজাকার একটি কূপ দেখলাম। এখনও জল আছে তাতে। এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল। পাশেই স্নানগার জাতীয় কিছু রয়েছে মনে হল। মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে শক্ত মাটির পাইপ। জল সরবরাহের জন্য। স্নানাগারের মাঝখানে রয়েছে জলটুঙ্গি। দূরে গড়ের আরেক প্রবেশদ্বার।

হঠাৎ একদল উড়িষ্যাবাসী ধেয়ে এল। ভাঙাচোরার স্তূপের মধ্যে অজগর আছে নাকি যাচাই করতে! খানিকটা খোঁচাখুঁচি করে বলল – সাপ আছে।

প্রাসাদ চত্বরের ভিতরে জগন্নাথস্বামীর মন্দির আছে। পূজার্চনা হয়। ঘনশ্যাম এই প্রথম ভগ্নস্তূপের ভিতরে প্রবেশ করল মন্দিরে প্রণাম জানাতে।

গড়প্রাসাদ ছাড়িয়ে কিছুদূর পরে পড়ল সিদ্ধ ভৈরব মন্দির। ইচ্ছে ছিল না তবু নামতে হল। ভৈরব মানে শিবের রুদ্রমূর্তি – মানে শিবই। শুনেছি রতনপুর থেকে আধ ঘন্টার দূরত্বে পালিতে রয়েছে কারুকার্যময় শিবমন্দির। এপথে আরেকটি দ্রষ্টব্য ছিল লাফাগড় দুর্গ। একদিকটা পাহাড়-ঘেরা অন্যদিকে সবুজ বন। মন্দিরে আছে অষ্টভুজা মেনকা দেবী বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বিরাজমান।

হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় ঘনশ্যাম জানিয়ে গেল যে ও বিকেলে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বিনা ভাড়ায়। স্টেশন যাওয়ার পথে এখানকার কালিবাড়ি ঘুরে গেলাম। অসময়ে এসেছি বলে দরজা বন্ধ। এদিকে বাঙালিদের স্কুল আছে। প্রবাসীদের দাবি তারাও বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম ধারক। গতকাল তারা ভাষাদিবস পালন করেছে উৎসাহের সঙ্গে।

চলার পথে দেখার জিনিসের অভাব নেই। সবকিছু কি দেখা যায়? যতটুকু মেলে তাতেই খুশিতে উপচে ওঠে মন। অমরকণ্টক দেখতে এসে ভোরমদেও দেখা আমাদের বাড়তি পাওনা। বিশেষ করে অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে, শহুরে সভ্যতা গ্রাস করার আগেভালে দেখতে পাওয়া এক বিরল প্রাপ্তি। মনে মনে বলি – আবার আসা যাবে।

বলাই সার। আবার আসা কি সহজ কথা! তবু এই আশা রাখা।